দৈনিক ইত্তেফাক

পরিবর্তনশীল বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে

২০১২ সালে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ

অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান

টাকার অবমূল্যায়ন আমদানিকে যদি কিছুটা নিরুৎসাহিত করে তবে আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় কিছুটা হ্রাস পাবে। ইতোমধ্যে এলসি খোলার হারের উপর এর কিছুটা প্রভাব পড়া শুরু হয়েছে, যা থেকে মনে হয় আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়ে তা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের জন্য কিছুটা স্বস্তিদায়ক অবস্থা ফিরিয়ে আনবে।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততা একদিকে যেমন বাংলাদেশের সামনে বহুমাত্রিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে, অন্যদিকে বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তনশীল চিত্র বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ঝুঁকির মাত্রাও বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের অর্থনীতির জন্য এটা নিঃসন্দেহে শক্তিমত্তার পরিচায়ক যে, নব্বই-এর দশকের শুরুতে অর্থনীতির উন্মুক্ততা (জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে আমদানি-রপ্তানির অংশ) যেখানে ছিল শতকরা ১৭ ভাগ, ২০১০-১১ অর্থবছরে তা এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫১ ভাগ। নব্বই-এর প্রারম্ভে যেখানে রপ্তানি দিয়ে আমদানির মাত্র ৫০ শতাংশ মেটানো যেত, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮ শতাংশে; বৈদেশিক সাহায্য (২০১০-১১ অর্থবছরে ১.৮ বিলিয়ন ডলার) ও বিনিয়োগ (২০২০-১১ অর্থবছরে ৮০০ মিলিয়ন ডলার) যোগ করলে আন্তর্জাতিক বাজার ও বিশ্ব-অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সম্পৃক্ততার গুরুত্ব আরো স্পষ্ট হয়ে আসে। অন্যদিকে, বৈদেশিক সাহায্য নব্বই-এর দশকের প্রারম্ভে যেখানে ছিল জিডিপি'র ৫.৬ শতাংশ, বর্তমানে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১.৬ শতাংশ। বৈদেশিক সাহায্য আর পণ্য রপ্তানির আয়-এর অনুপাত যেখানে ছিল প্রায় সমান, সেখানে বর্তমানে রপ্তানি আয় বৈদেশিক সাহায্যের প্রায় ১৩ গুণ, আর প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স যোগ করলে তা দাঁড়াবে প্রায় ২০ গুণ। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রপ্তানি ও রেমিটেন্সের গুরুত্ব এ থেকেও বোঝা যায় যে, ২০১০-১১ অর্থবছরে এ দু'খাত থেকে বৈদেশিক মুদ্রা এসেছে ৩৪.৫ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ, যেখানে আমদানি ছিল ৩৩.৭ বিলিয়ন ডলার, আর জিডিপি ছিল প্রায় ১১০ বিলিয়ন ডলার।

উল্লেখিত পরিসংখ্যানের তাৎপর্য হ'ল এই যে, অন্য যেকোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক বেশি পরিমাণে আন্তর্জাতিক পণ্য ও সেবা বাজারের উপর নির্ভরশীল। আর এ বাস্তবতার ইতিবাচক দিকটা হ'ল এটা সম্ভব হয়েছে পণ্য ও সেবা বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের মাধ্যমে। এ সম্পৃক্ততার ফল অবশ্য দ্বিবিধ হতে পারে—আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার উপর স্থানীয় উৎপাদক ও উদ্যোক্তাদের ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা ইতিবাচক তখনই যখন একদিকে সে বাজারে চাহিদা থাকে ও অন্যদিকে দেশে উৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। তা যদি না হয়, তবে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, আমদানি সক্ষমতা, স্থানীয় মুদ্রার বিনিময় হার, জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ও সর্বোপরি সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে তা দুর্বল ও ঝুঁকির মুখে ফেলে দিতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, এখানে সম্পর্কটি দ্বিমুখী—যেকোন উন্মুক্ত অর্থনীতির জন্য আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সামগ্রিক অবস্থা যেমন দেশের অর্থনীতির উপর অভিঘাত রাখে, অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা ও তার উৎকর্ষতাও বিশ্ব বাজারের অবস্থানের শক্তিমত্তাকে অনেকটা নির্দিষ্ট করে দেয়। সম্ভাব্য এ দ্বিবিধ অভিঘাতের আলোকে বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতাসমূহের সাথে মিলিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে ২০১২ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততার নিরিখে কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ পর্বে প্রবেশ করতে যাচ্ছে বলেই মনে হয়।

বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় সাফল্যের দিক ছিল অপেক্ষাকৃত নিম্ন মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে জিডিপি'র উত্তরোত্তর বৃদ্ধিমান প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার—২০০৮-০৯, ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ এ তিন বছর এ সূচকদ্বয় ছিল শতকরা ৬.৭ ও শতকরা ৫.৭ ভাগ, শতকরা ৭.৩ ও শতকরা ৬.১ ভাগ ও শতকরা ৮.৮ ও ৬.৭ ভাগ। এটা ঠিক যে, মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছিল; কিন্তু প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান হারের প্রেক্ষাপটে অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও তা অপ্রত্যাশিত ছিল না। ২০১১-১২ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির প্রাক্কলন ধরা হয়েছে শতকরা ৭.০ ভাগ, যেখানে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলিত হারও শতকরা ৭.০ ভাগ। ইতোমধ্যে ২০১১ সালের নভেম্বরে মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে (পয়েন্ট টু পয়েন্ট মাফিক অর্থাৎ গত বছরের একই মাসের তুলনায়) শতকরা ১০.৫ ভাগ, অর্থাৎ বছর শেষের প্রাক্কলিত হারের চেয়ে সাড়ে তিন পার্সেন্ট পয়েন্টেরও বেশি। উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল এ মূল্যস্ফীতি স্থির ও স্বল্প আয়ের মানুষদের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করছে ও দেশে আয় বণ্টনের বিরাজমান বৈষম্যকে আরো প্রকট করছে। মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির এ প্রবণতার আরেকটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হ'ল খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যপণ্য-বহির্ভূত (মূলত যেটাকে কোর ইনফ্লেশন বলা হয়) মূল্যস্ফীতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি (এর নেতিবাচক দিক হ'ল নন-কোর অর্থাৎ খাদ্যপণ্য মূল্যস্ফীতি বাড়া ও কমার দোলাচলে উঠা-নামা করার সাধারণ একটা প্রবণতা থাকলেও কোর ইনফ্লেশন একবার বাড়তে থাকলে তার রাশ টানা অপেক্ষাকৃত শক্ত)।

বিশ্ব অর্থনীতির আলোচনার সাথে মূল্যস্ফীতির আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা হ'ল বাংলাদেশের চলমান ও বৃদ্ধিমান মূল্যস্ফীতির একটা বড় ড্রাইভিং ফ্যাক্টর বা চালিকাশক্তি হচ্ছে আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতি। আমাদের জিডিপি যেখানে ১১০ বিলিয়ন, সেখানে আমদানির পরিমাণ ৩৩.৭ বিলিয়ন বা জিডিপি'র ৩০.৪ শতাংশের সমপরিমাণ। অনেক উন্নয়নশীল দেশে এ হার হয়ত আরো বেশি; কিন্তু বাংলাদেশের আমদানির কাঠামোও এক্ষেত্রে বিবেচ্য। আমদানি পণ্যের গঠন বিবেচনায় নিলে দেখা যাবে, সেখানে খাদ্যশস্য, জ্বালানি, সার ও কাঁচামালের আমদানি একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এবং এগুলোর ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি বাংলাদেশের স্থানীয় বাজারে প্রতিফলিত হচ্ছে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ দ্রব্যমূল্যের উপর চাপ সৃষ্টি করছে ও মূল্যস্ফীতিকে উসকে দিচ্ছে। এর প্রভাব সেসব পণ্যের উপরেও পড়ছে যেগুলোতে স্থানীয় উৎপাদন মোট চাহিদার অধিকাংশ বা একটা বড় অংশ মেটায় (যেমন: চাল, তেল, চিনি)। যেসব পণ্য পুরোমাত্রায় আমদানির উপর নির্ভরশীল (যেমন: জ্বালানি তেল, যার আমদানি হয় একচেটিয়াভাবে সরকারি খাতে ও বিক্রি হয় সরকারি ব্যবস্থাপনায় ভর্তুকি মূল্যে), সেগুলোরও মূল্য সাম্প্রতিক অতীতে আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। এ মূল্যবৃদ্ধির কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভর্তুকির চাপকে সামাল দেয়ার জন্য মূল্য সমন্বয় হচ্ছে, যা মূল্যস্ফীতিকে ভোক্তা পর্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে ও উৎপাদন ব্যয় এবং পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধিসহ অন্যান্য অভিখাত সাপেক্ষে পরোক্ষভাবে উসকে দিচ্ছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, বর্তমান সরকার যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ছিল ৪৩.৮ ডলার, বর্তমানে তা ৯২.৭ ডলার। একই ধরনের প্রবণতা দেখা যায় চিনি (পূর্বে ২৭.৭ ও বর্তমানে ৬৫.৩), সার (পূর্বে ২৬৩.৩ ও বর্তমানে ৩৭৪.১) ও অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও। ভর্তুকি হ্রাসের মাধ্যমে মূল্য সমন্বয়ের প্রভাব স্থানীয় বাজার মূল্যস্তরকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। টাকার অবমূল্যায়ন (সরকার গঠনের সময় থেকে প্রায় দু'বছর অপরিবর্তিত থাকার পর গত এক বছরে শতকরা ১৫.৮ ভাগ ডলারের বিপরীতে অবমূল্যায়িত) মূল্যস্ফীতিকে আরো উসকে দিয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর ক্রমবর্ধমান চাপের (জুন ২০১১-তে ১০.৯ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় সাম্প্রতিক সময়ে ৯.৪ বিলিয়ন ডলার) কারণে টাকার বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রাবাজারে হস্তক্ষেপ করার সক্ষমতাও বর্তমানে সীমিত। টাকার অবমূল্যায়ন আমদানিকে যদি কিছুটা নিরুৎসাহিত করে তবে আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় কিছুটা হ্রাস পাবে। ইতোমধ্যে এলসি খোলার হারের উপর এর কিছুটা প্রভাব পড়া শুরু হয়েছে, যা থেকে মনে হয় আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়ে তা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের জন্য কিছুটা স্বস্তিদায়ক অবস্থা ফিরিয়ে আনবে।

এটা অবশ্য কিছুটা স্বস্তিদায়ক যে, রপ্তানি আয় প্রবৃদ্ধির হার (বর্তমান ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে শতকরা ১৭.৩ ভাগ) এ অর্থবছরের প্রাক্কলিত হারের (শতকরা ১৫.৬ ভাগ) চেয়ে এখনও কিছুটা বেশি, যদিও রেমিটেন্স প্রবাহের হার (অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে শতকরা ৭.৬ ভাগ) ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রাক্কলনের (শতকরা ৯.০ ভাগ) চেয়ে কিছুটা কম। কিছুটা দুশ্চিন্তার ব্যাপার হ'ল রপ্তানি আয় ও রেমিটেন্সের প্রবাহ প্রবৃদ্ধির হার বর্তমান সময়ে বেশ উঠা-নামা করছে - যেমন: এ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে রপ্তানির গড় প্রবৃদ্ধি ২২.৬ শতাংশ হারে হলেও সেপ্টেম্বরে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি (২০১০-এর সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় শতকরা ২.৪ ভাগ) কিছুটা শ্লথ হয়ে পড়ে, যা অক্টোবরে শতকরা ১৫.৫ ভাগ প্রবৃদ্ধির পরে আবার নভেম্বরে কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২.৪ হারে; রেমিটেন্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধির হার গত বছরের তুলনায় সেপ্টেম্বরে শ্লথ হয়ে (শতকরা ০.৬ ভাগ) অক্টোবরে আবার বেড়েছে (শতকরা ১২.৫ ভাগ বৃদ্ধি), আবার নভেম্বরে কমে (শতকরা -৮.৩ ভাগ হ্রাস) ডিসেম্বরে বেড়েছে (যদিও সম্পূর্ণ মাসের হিসেব এখনও পাওয়া যায়নি; তবে প্রবণতা থেকে আশা করা যায় যে, ডিসেম্বর মাসে প্রবৃদ্ধির হার ভালো হবে)। বিকাশমান ইউরোজোন ক্রাইসিসের দিকে তাই সতর্ক নজর রাখা প্রয়োজন, যদিও বাংলাদেশের মূল বাজার—জার্মানী, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের অর্থনীতি অন্য দেশগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। ২০১২ সালে এসব দেশের জিডিপি-প্রবৃদ্ধির হারও এখন কম হবে বলে প্রাক্কলন করা হচ্ছে। উন্নত বিশ্বের অর্থনীতির সাথে রেমিটেন্স প্রবাহের সম্পৃক্তি উপেক্ষা করার মতো নয়—প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রেমিটেন্স বাংলাদেশে আসে উন্নত বিশ্ব থেকে। অবমূল্যায়িত টাকা এক্ষেত্রে কিছুটা প্রণোদনা দিলেও বিশ্ব-অর্থনীতির হাল-চালের উপরেই মূলত রপ্তানি ও রেমিটেন্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি, অন্তত মধ্যমেয়াদে, নির্ভর করবে। একটা ইতিবাচক দিক হ'ল সর্বসম্প্রতিকালে এশীয় বাজারে (যেমন: জাপান, তুরস্ক, ভারত) বাংলাদেশের রপ্তানি দ্রুত হারে বাড়ছে। ২০১২ সালে এসব দেশের তুলনামূলক ভালো প্রবৃদ্ধির সুযোগ নেয়ার উপর জোর দিতে হবে, বাজার ও পণ্য বৈচিত্র্যকরণের উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, আমাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। স্থানীয় মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি ও পণ্যমানের উৎকর্ষতা নিশ্চিত করতে হলে উৎপাদনের স্থানীয় ভেল্যু-চেইনের প্রতিটি পর্যায়ে দক্ষতা ও প্রযুক্তির যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। ইউরোপীয় বাজারে তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে রুল্‌স অব্ অরিজিন-এর সাম্প্রতিক পরিবর্তন ও ভারতের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের সুযোগ কার্যকরভাবে ব্যবহারের জন্য পণ্যভিত্তিক ও বাজারভিত্তিক বিশ্লেষণ-নির্ভর পণ্য ও বাজার বৈচিত্র্যকরণ কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্ববাজারের সাথে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততার সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনার সংশ্লিষ্টতার প্রাসঙ্গিকতা এ কারণে যে, বর্তমান অর্থবছরের শেষের দিকে সামষ্টিক অর্থনীতিতে যেসব ঝুঁকি দেখা যাচ্ছে সেগুলোকে দক্ষতার সাথে সামাল দিতে না পারলে এসব ঝুঁকি বৈদেশিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। ২০১১-১২ অর্থবছরে বাজেটের ঘাটতি জিডিপি'র শতকরা পাঁচ ভাগের সমপরিমাণ হবে বলে মনে হচ্ছে। বৈদেশিক সাহায্যের অপ্রতুলতার কারণে (প্রকৃতপক্ষে নীট বৈদেশিক প্রাপ্তি এ বছর এখন পর্যন্ত নেতিবাচক!) এ ঘাটতির বড় অংশই স্থানীয় বিভিন্ন সূত্র থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থায়ন করতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক খাত থেকে সরকারের বর্ধিত ঋণ ইতোমধ্যেই একদিকে মূল্যস্ফীতি উসকে দিচ্ছে, অন্যদিকে ব্যক্তিখাতের ঋণ প্রাপ্তির উপর চাপ সৃষ্টি করছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্রুত অবমুক্তি ও ব্যাংক বহির্ভূত (যেমন: সঞ্চয়পত্র) খাত থেকে বাড়তি ঋণ গ্রহণ এক্ষেত্রে অর্থায়নের এ ধরনের চাপকে কিছুটা প্রশমিত করতে পারবে। অন্যদিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রাধিকারসমূহ পুনর্মূল্যায়ন করে ও রাজস্ব ব্যয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কিছুটা ব্যয় সংকোচনমূলক পদক্ষেপের প্রয়োজন হবে। সরকার ইতোমধ্যে জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান ভর্তুকির চাপ হ্রাসের কৌশল অবলম্বন করেছে। ভোক্তা ও উৎপাদক পর্যায়ে এর অভিঘাত মূল্যস্ফীতিকে আরো উসকে দেবে, যদিও এর বিকল্প কৌশল অর্থাৎ অধিক ঋণ গ্রহণ, সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর চাপ সৃষ্টি করছে। জ্বালানি ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি করে ভর্তুকির সমন্বয় থেকে ক্রমান্বয়ে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ হ্রাস করে ভর্তুকির সমন্বয় না করতে পারলে আগামীতে জ্বালানি-বিদ্যুতের ভোক্তা পর্যায়ে মূল্য আরো কয়েকদফা ও অধিকমাত্রায় বাড়াতে হবে, যা স্বল্প আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করবে, জনদুর্ভোগ বাড়াবে ও মূল্যস্ফীতির উপরও চাপ এতে করে অব্যাহত থাকবে। বৈদেশিক বাজার-নির্ভর স্থানীয় খাত ও স্থানীয় আমদানি-প্রতিস্থাপক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার উপর যে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের জানুয়ারি-জুন ২০১২ মুদ্রানীতির ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ—কিছুটা সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করে ও উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িত নয় এমন সব খাতে ঋণ প্রবাহ সীমিত করেই এটা করতে হবে। নিঃসন্দেহে এটি হবে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ব্যাংকিং খাত থেকে সরকারের অধিক ঋণ গ্রহণ যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য সমস্যাসঙ্কুল হতে পারে সে ব্যাপারেও বাংলাদেশ ব্যাংককে স্পষ্ট ভাষায় সামগ্রিক চিত্র সরকারের কাছে তুলে ধরতে হবে।

উপরের আলোচনার সার কথা হ'ল বিশ্ব-অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতির সম্পৃক্ততা যেহেতু ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, সেহেতু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মূল সূচকের গতি-প্রকৃতি এ সম্পৃক্ততার ইতিবাচক বা নেতিবাচক অভিঘাতের উপর ক্রমশই নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এ অভিঘাতের ধরন প্রকৃত বিচারে কি হবে তা অনেকটাই নির্ভর করবে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যে মন্দার অশনি সংকেত দেখা যাচ্ছে, সেটাও এ সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে। সে সম্ভাব্য মন্দার অভিঘাত কিভাবে ও কতটুকু সামাল দেয়া যাবে, সেটাও দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করবে। এ উভয়বিধ দিক থেকে বিবেচনা করলে সামষ্টিক অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে ২০১২ সাল হবে বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জের বছর।

[লেখক: নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)]